আজকের কাগজ
তারিখ ... 18 AUG
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রিদের সুখ-দুঃখ

অনেকের মতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাসের হাসপাতাল। এখানে ভালো ভালো ছেলেদের সেবিকার মতো ভালিয়ে ভুলিয়ে সন্ত্রাসী বানানোর চেষ্টা করা হয়। 'একবারে না পারিলে দেখ শতবার'—এ নীতি নিয়েই সন্ত্রাসী হাসপাতালের ডাক্তাররা অগ্রসর হয়। ক্লাসে অস্ত্র, হলে অস্ত্র, ক্যান্টিনে অস্ত্র, লাইব্রেরীতে অস্ত্র, পুরা ক্যাম্পাসেই অস্ত্র সর্বত্রই অস্ত্রের ছড়াছড়ি। এ অস্ত্রাগারের মধ্যে থেকেই প্রতিবছর কৃতিত্বের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক তরুণ-তরুণী। সন্ত্রাস অবশ্য অনেককেই সে সুযোগ দেয় না। অস্ত্রবাজি না করলেও অনেককেই বেঘোরে প্রাণ হারাতে হয়। তার লাশ নিয়ে আবার রাজনীতিও চলে। এ দল বলে এ লাশ তাদের ও দল প্রতিবাদ জানিয়ে বলে এ লাশ তাদেরই হবে। বাস্তবে দেখা যায়, যে লাশ হয়েছে সে আদৌ কোনো রাজনীতি করত না।

সন্ত্রাস ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রিদের রয়েছে নানা রকম সমস্যা। এর মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে খাদ্য সমস্যা। হলে ছাত্র-ছাত্রিরা যা খায় তা' খেয়ে লেখাপড়া করা প্রায় অসম্ভব। এজন্যে বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই ভোগে নিম্ন রক্তচাপ এবং অপুষ্টিজনিত সমস্যায়। কেন্টিনগুলোতে যা রান্না হয় তা, মুখেই দেয়া যায় না। আর ডাল? সে তো পুকুরের ঘোলা পানি। কিন্তু এদিকে লক্ষ্য নেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের, লক্ষ্য নেই হল প্রশাসনের। বস্তুত এ কারণেই কিছুদিন আগে ফুড পয়জনে মহসীন হলের তিনশতাধিক ছাত্র

অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো। এ ঘটনা নতুন কিছু নয়। এর আগেও জহুরুল হক হল এবং জগন্নাথ হলে অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিলো। অনেকের মতে খাদ্যের দাম ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকলেও সকলের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য নয়। কেননা, হলে যারা থাকে তাদের বেশিরভাগই গ্রামের মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে হলে অবস্থান করছে এমন অনেক ছেলেমেয়ের বাবা দিনমজুর। তাই এদেরকে টিউশনি করে কিংবা অন্য কোনো পার্টটাইম চাকরি করে নিজের খরচ নিজেকেই চালাতে হয়. বাড়ি থেকে যাদের টাকা আসে তাও প্রয়োজনের তুলনায় কম। তাই তাদেরকেও খণ্ডকালীন চাকরি/টিউশনির দ্বারস্থ হতে হয়। সুতরাং এ কথা বলা অপ্রাসংগিক হবে না যে, হলে অবস্থানকারী ছাত্র-ছাত্রিদের জীবন সুখের নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রিদের সমস্যা এখানেই থেমে নেই। তাদের রয়েছে সিট সমস্যা। রয়েছে লেখাপড়ার সমস্যা। প্রথম বর্ষের কোনো ছাত্র-ছাত্রীকেই হল কর্তৃপক্ষ সিট দেয় না। তবে ডাবলিং করার পরামর্শ দেয়। নিজের লোক না থাকলে কেউ ডাবলিং রাখতে চায় না। এজন্যে তাকে ধর্ণা দিতে হয় ছাত্র সংগঠনের নেতাদের কাছে। বার বার হাঁটা চলার পরে একটা সিট পেলেও শান্তি নেই। কেননা তাকে মূলত স্থান করে দেয়া হয় একটি গুদাম ঘরে। এক টেবিলে পড়তে হয় একাধিক জনের। রাতে ঘুমাতে হয় ফ্লোরে। ইচ্ছা-অনিচ্ছায় যেতে হয় মিছিল-মিটিং এ। শরীর খারাপ থাকলেও নিস্তার নেই। আবার যারা সিট পেয়েছে তাদেরও শান্তি নেই। সন্ত্রাসিরা তার নামে বরাদ্দকৃত আসনে দখল দিতে চায় না। দিলেও শর্তসাপেক্ষে। স্বাভাবিকভাবে সিট পেয়েও শান্তি নেই। কেননা এক রুমে যতজন ছাত্র থাকার কথা তা থাকে না। মানবিক কারণে অনেকে চাপের মুখে ডাবলিং রাখতে বাধ্য হয়। এর ফলে কোনো একটি রুমের পরিবেশ তার স্বাভাবিকতা হারায়। সবার মাঝে কেনো যেনো এক ধরনের সচেতনতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। কারও দিকে কারও লক্ষ্য নেই। পরীক্ষা থাকলেও ড্যাম কেয়ার। রুমে সমানে চলে আড্ডা। চলে তাস খেলা। চলে ইচ্ছানুযায়ী টেপরেকর্ডার বাজানো।

হলগুলোর রুমের পরিবেশই শুধু পড়ালেখার অনুপযুক্ত নয়, পড়ালেখার অনুপযুক্ত লাইব্রেরীও। লাইব্রেরীর অবস্থা দেখলে মনে হয় সেখানে কর্তৃপক্ষের কোনো নিয়ন্ত্রণেই নেই। বিরাট গরু-ছাগলের হাট আর কি। লাইব্রেরীর মধ্যে সমানে চলে গল্প, সমানে চলে প্রেম। নামমাত্র ছাত্র-ছাত্রিদের সামনে থাকে বই, থাকে খাতা। এরই মধ্যে অনেক জ্ঞান পিপাসু শিক্ষার্থী বইয়ের অতল গভীরে ডুবে থাকে। কোনদিকে লক্ষ্য থাকে তার। তার একমাত্র লক্ষ্য আমাকে ভালো রেজাল্ট করতেই হবে। প্রতিষ্ঠিত হতে হবে জীবনে। সত্যিকার অর্থে এ প্রবণতার শিক্ষার্থিরা ভালো রেজাল্ট করে, মুখোজ্জ্বল করে দেশ ও দশের। কিন্তু যারা ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আজ অবস্থার শিকার হয়ে আছে তাদের কি হবে? দেশ ও সমাজ তাদের কাছে কি প্রত্যাশা করবে?

গোপাল চন্দ্র সরদার